উপসংহার

'বিবর্তনের ধারায় প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিব চরিত্র' শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে শিবের বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক স্বরূপের আলোচনা আবশ্যক। বেদ ভাষ্যকার ও বৈয়াকরণ উবট শিব শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন— শিব শান্ত নির্বিকার; মহীধরও তাঁর ভাষ্যে বলেছেন— শিব কল্যাণরূপ নিষ্পাপ। কিন্তু শিবের উগ্র ভয়ঙ্কর মূর্তির বিবরণ রয়েছে মহাভারতে, যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন অশ্বত্থামা, মহানির্বাণ তন্ত্রের চতুর্দশ উল্লাসে শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময় বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার রুদ্রযামলে 'হৌঁ' এই একাক্ষর মন্ত্রকেই 'প্রসাদবীজ' বলা হয়েছে। এই মন্ত্রে শিবের যে রূপ কল্পনা করা হয়, তা হল -- মহাদেব মুক্তাবর্ণ, পীতবর্ণ, মেঘবর্ণ, শুক্লবর্ণ ও জবাকুসুমবর্ণ সম্পন্ন পাঁচমুখ বিশিষ্ট এবং প্রতি মুখে ত্রিনেত্র, কপালে একফালি চাঁদ, কিন্তু তাঁর শরীরের আভায় কোটি চন্দ্রের প্রভাও হার মানে। হাতে তাঁর নানাবিধ অস্ত্র, যেমন— শূল, টঙ্ক, খড়্গ, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘন্টা, অঙ্কুশ, পাশ এবং অভয়মুদ্রা, তাঁর বেশভূষাও উজ্জ্বল। এরপর উল্লেখযোগ্য শিবের অষ্টাক্ষর মন্ত্র যা গৌতমীতন্ত্রে দেখা যায়— 'হ্রীঁ ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীঁ।' এই মন্ত্রে শিবের ধ্যান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— ''শিবের দেহকান্তি বন্ধুকপুষ্পের ন্যায়, ইনি ত্রিনেত্র, হাস্যবদন, এঁর ললাটে শশীকলা রয়েছে। করে শূল, নরকপাল, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা। বাম উরুতে নিজপ্রিয়া সমাসীন আছেন, এক হাতে রক্তোৎপল; এবং সর্বশরীরে মণিময় বিভূষণ। অন্য হাতে প্রিয়াকে আলিঙ্গনরত।''[১] কাপালিক সম্প্রদায় এই শিবের আরাধনা করে থাকেন। নীরোগ এবং সুস্থ শরীরের জন্য, কখনও কখনও শত্রু নিধনের জন্যও মৃত্যুঞ্জয় শিবের আরাধনা করা হয়। এই মৃত্যুঞ্জয়ের ত্র্যক্ষর মন্ত্র হল— 'ওঁ জূংসঃ', তবে সাধারণত মানুষ মৃত্যুকে জয় করার জন্য এই শিবের আরাধনা করেন।

যুগ যুগ ধরে সৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অসীম। এই কৌতূহল নিরসনে মানুষ নিজের অতি পরিচিত জগৎ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যে সব পুরাণ কথার সৃষ্টি করেছে, তাতে সৃষ্টিকর্তারূপে মানুষের নিত্য সাথী পশুকে আদি-ব্যক্তিত্বরূপে পাওয়া যায়। যদিও সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, তথাপি মানুষ নিজের অজান্তেই আদিম পশুপূজোকে বহন করে চলেছে। ঐ সব আরাধ্য পশুর উপরে পড়েছে সভ্যতার আস্তরণ, ক্রমে ঐ সব পশু রূপ পাল্টে হয়েছেন মনুষ্যাকৃতি দেবতা, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য নন্দী বা ষাঁড় পূজাই কালক্রমে শিব পূজায় রূপান্তরিত হয়েছে। সারা বিশ্বের অপরিশীলিত পুরাণ কথায় বলা হয়েছে যে পৃথিবীর সৃষ্টি কোন এক স্রষ্টার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে। শিব পুরাণের বিভিন্ন পর্যায়ে এর উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় শিবের শরীরজাত। বিশ্বে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-তারা, নক্ষত্র, দেবতা, রাক্ষস, মানুষ এছাড়া সমস্ত জঙ্গল, পশু, পাখি, কীট, লতাগুল্ম, বৃক্ষাদি সমস্তই শিব থেকে উৎপাদিত এবং সেখানে সমাহিত। শিবের মস্তক থেকে সৃষ্টি

হয়েছে স্বর্গলোক, নাভি থেকে আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি হয়েছে দুটি নেত্র থেকে, তাঁর কর্ণ থেকে জন্ম হয়েছে দিক্‌সকলের এবং পৃথিবী হল শিবের চরণ। এছাড়া সমাজে যে বর্ণাশ্রম প্রথা রয়েছে তারও সৃষ্টিকর্তা শিব। তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণগণ, বক্ষস্থল থেকে ক্ষত্রিয়গণ, উরুদ্বয় থেকে বৈশ্যগণ এবং পদদ্বয় থেকে শূদ্রগণ উৎপন্ন হয়েছেন।

শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারায় দেখা যায়, শিব শুধুমাত্র দেবতার জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বিবর্তিত শিবের সবচেয়ে উগ্ররূপ হল বীরভদ্র। সতীর প্রাণত্যাগের পর ক্রোধে উন্মত্ত মহাদেবের মুখ থেকে, মতান্তরে ক্রোধাগ্নি থেকে মতান্তরে ক্রোধান্বিত শিবের ছিন্ন জটা থেকে প্রবল পরাক্রান্ত বীরভদ্রের জন্ম, যিনি দেবতাদের জব্দ করেন এবং একই সঙ্গে বহু গণদেবতার জন্ম দেন। নিত্য বিবর্তনশীল মানবসভ্যতার মূল কথা হল— শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বকথা। তাই পরমেশ্বর শিব মানুষের হাতে রূপ পেয়েছেন শঠ ও প্রতারকরূপে।

রুদ্র একজন বৈদিক দেবতা, এই রুদ্র এবং শিবকে অভিন্ন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। বৈদিক রুদ্র ধ্বংসের দেবতা - তিনি উগ্র, হিংস্র ও পশুতুল্য, তাঁর হাতে বজ্র ও ধনুর্বাণ, সবল তাঁর দেহ, তিনি প্রদীপ্ত এবং তাঁর বর্ণ পিঙ্গল। ধ্বংসের কর্তা— ধ্বংসরূপী যে রুদ্র তিনি কেবল ধ্বংসের দেবতা নন, তিনি আরোগ্যের দেবতাও। এখানেই রুদ্রের মঙ্গলময়ত্ব, ঋগ্বেদের অগ্নিসূত্রে রুদ্রের অপর নাম অগ্নি এবং শিব যে রুদ্রেরই অপর নাম সে সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। রুদ্র যখন শিব হয়েছেন তখন তিনি মঙ্গলের দেবতা, আশুতোষ - সর্বত্যাগী মহাযোগী, তিনি যোগীর আদর্শ যোগীশ্বর, ক্ষমার আদর্শ ভোলানাথ, ত্যাগীর আদর্শ সর্বত্যাগী হলেন— এককথায় রুদ্রের ভয়ঙ্করত্ব চলে গিয়ে তিনি হলেন শিবসুন্দর।

রুদ্র-শিবের উপাসনা যখন ব্যাপকতা লাভ করল তখন বিভিন্ন আর্যেতর জাতির মধ্যে শিব নিজ প্রতিষ্ঠা কায়েম করলেন। শিব হলেন এমন এক দেবচরিত্র যার শুরু টোটেম ভাবনা থেকে এবং যিনি প্রতিটি বিবর্তন স্তরের উৎপাদন হিসেবে গণনীয় হয়েছেন। এরপর অনার্য অবৈদিক আদিম জনগোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে শিবের আর্যীকরণ ঘটে। মহাভারতে-পুরাণে শিব জগৎ রক্ষা করতে কালকূট বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। তিনি যোগিরাজ হয়েও কামুক, লম্পট; মহাভারতে তিনি কিরাত রূপে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সামান্য স্তব অথবা বিল্বপত্রে তুষ্ট হয়ে শিব অসুরদের বর দিয়ে দেবতাদের বিপর্যয় ডেকে এনেছেন, আবার দানববধেও মেতে উঠেছেন। কখনও আবার ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করেছেন দ্বারে দ্বারে। বাংলাদেশে এসে কৃষিকর্ম ও আর্যেতর বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় কোচ, ডোম, বাগ্দী, কিরাত প্রভৃতি জাতির সঙ্গে শিবের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এই সকল বৈশিষ্ট্য নিয়েই বৈদিক রুদ্র

পৌরাণিক যুগে শিব হয়েছেন এবং বাংলায় পৌঁছে পুরোপুরি কৃষিদেবতায় পরিণত হয়েছেন।

ভারতের অসংখ্য দেবদেবীর মধ্যে শিবই একমাত্র দেবতা যিনি আসমুদ্র হিমাচলবাসী জনগণের মধ্যে অগ্রতম স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতীয়রা মনে, প্রাণে, শাস্ত্রে, সাহিত্যে, শিল্পে-মন্দিরে-মূর্তিতে স্থান করে দিয়েছেন শিবের। এই শিবকে কেন্দ্র করেই আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছে। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে শিবকে দেবতারূপে পাওয়া না গেলেও তাঁর প্রতিরূপ রুদ্র হয়েছেন। পরবর্তীকালে এই রুদ্রই শিব অর্থাৎ মঙ্গলকারী দেবতায় পরিণত হয়েছেন। যজুর্বেদেও শিব পূর্ণ মহিমায় বিরাজমান। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর বৈয়াকরণ পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী', ও খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'-এ রুদ্র ও শিবের উল্লেখ রয়েছে। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে রুদ্র ও শিবকে লৌকিক দেবতা বলেছেন।

শিব হিন্দু পুরাণের উল্লেখযোগ্য দেবতা। ঋগ্বেদে 'শিব' শব্দটি থাকলেও তাঁর প্রয়োগ নিছক বিশেষণীয় রূপে, যা দিয়ে দেবতাদের শান্তরূপকে তুলে ধরা হয়েছে; শিব শব্দের আভিধানিক অর্থ মঙ্গলময়তা। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিবের মঙ্গলময় রূপকে বজায় রেখে তার মধ্যে রুদ্রের উগ্রতাও দেখা গেল, এর ফলে দেবতা শিবের মধ্যে পরস্পরবিরোধী দুই স্বভাবের সমাবেশ ঘটল। তিনি বিবেচিত হলেন প্রজনন ও ধ্বংসের দেবতারূপে। একদিকে তিনি গৃহবাসী, অন্যদিকে কর্পদকশূন্য সন্ন্যাসী। শিব একইভাবে ভীতি ও প্রীতির দেবতারূপে দেখা দিয়েছেন হিন্দু পুরাণে শিব কল্পনার পিছনে আর্য না অনার্য ভাবনা সক্রিয়— সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। শিবের আকৃতি-প্রকৃতিতে, হাবে-ভাবে, পোষাকে-আসাকে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যাতে তাঁকে আর্য ও অনার্য উভয় শ্রেণীতে ফেলা চলে। সম্ভবত এই দুই বিপরীত চিন্তার মিশ্রণ ঘটে গেছে শিব কল্পনায়। ফলে একাধিক বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণের সমন্বয়ে রুদ্র-শিবের ধারণাটি গড়ে উঠেছে। তবে সময়ের আবর্তনে রুদ্রের উগ্রতা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে তা স্থিত হল শান্ততায়।

দেবতা হিসেবে শিব যে একদা অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন তার প্রমাণ মেলে দক্ষের গল্পে। জামাতা হওয়া সত্ত্বেও রাজা দক্ষ শিবকে উপযুক্ত সমাদর করতেন না, সুযোগ পেলেই অপমান করতেন।; এই শিব শ্মশানচারী, ভস্মভূষিত, নেশাগ্রস্ত, নরকপালধারী— যা স্পষ্টত অনার্যদের চিহ্ন বহন করে। আর্যদের বাংলায় প্রবেশের আগে প্রাগার্য গোষ্ঠীর মানুষ কৃষি ও প্রজননের দেবতারূপে পাথরের লিঙ্গ মূর্ত্তিকেই পূজো করত। ইতিহাসের ঠিক কোন্ পর্যায়ে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন হয়েছিল সে কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও, শিব তাঁর অনার্য স্বভাব বর্জন করতে পারেন নি। আর্য শিবকে নিয়ে প্রাচীন

ভারতবর্ষে দুটি সাহিত্যিক মহাকাব্য রচিত হয়েছিল— 'কুমারসম্ভবম্' ও 'কীরাতার্জুনীয়ম্'।

বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরুষদেবতা হলেন শিব। বাঙালীর শিব তাঁর ওপরে আরোপিত 'আর্যত্বের' ভস্ম প্রলেপ মুছে ফেলে স্বকীয় মূর্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত বলেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এত কাছের মানুষ। বাঙালীর কল্পনায় যে শিব, তিনি দেবাদিদেব মহাদেব শুধু নামেই, তিনি কার্যত গৃহস্থ একটি মানুষ। শিব এবং তাঁর পত্নী গৌরী বা পার্বতীকে আমাদের চির-চেনা এক নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রামীণ প্রতিবেশী দম্পতি বলেই মনে হয়। শিব তাই বাঙালীর বিচারে চাষী হয়ে ধান বোনেন, নেশাখোর বৃদ্ধরূপে শ্মশানে-মশানে ঘোরেন, দারিদ্রের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সংসার করেন এবং অতি অল্পে রুষ্ট ও তুষ্ট হন। তাই শিব আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।

শিবকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের বাংলায় দুই ধরনের কাব্যধারা গড়ে উঠেছিল। একটি ধারা 'নাথ সাহিত্য', অপরটি 'শিবায়ন'। এছাড়াও প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে শিবের কাহিনী রয়েছে। নাথ সাহিত্য মূলতঃ সংযমপন্থী নাথযোগীদের অলৌকিক কাণ্ডকারখানার বিবরণ। প্রাচীন ভারতের কায়া সাধনা ভিত্তিক যোগপন্থার সঙ্গে এ মত ও পথের অচ্ছেদ্য সংযোগ বর্তমান। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, ময়নামতী প্রমুখ সিদ্ধ-সিদ্ধারাই নাথ সাহিত্যের আখ্যানে মুখ্য হয়ে উঠলেও নাথ যোগীদের আদর্শ হলেন শিব, তিনিই আদিনাথ। নাথ কাহিনীতে শিবের যে-রূপ প্রকাশিত সেখানে লৌকিকতার স্পর্শমাত্র নেই। এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন— ''নাথসাহিত্যে সিদ্ধাচার্য এবং তাঁহাদিগের শিষ্যা ও শিষ্যদের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত এবং তাঁহাদের অপার্থিব কার্যকলাপেরই বর্ণনা করা হইয়াছে।''[২] কিন্তু মঙ্গলকাব্যের আখ্যানে শিব-চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হয়েছে, সেখানে শিবের প্রকৃতি অনেক বেশি লোকায়িত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— শিবায়ন কাব্যধারার মধ্যেও বিষয়বস্তুর এরূপ দ্বিমুখী বিভাজন রয়েছে। এক অংশে আছে দেবতা শিবের মাহাত্ম্যকথা ও তাঁর পূজা প্রচারের কাহিনী, যা 'মৃগলুব্ধ' নামে পরিচিত। অপর অংশে রয়েছে শিবের গার্হস্থ্য জীবন কথা — এখানে তিনি রক্ত-মাংসের সজীব মানুষ। দ্বিতীয় ধারাটিই তুলনামূলকভাবে বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয়। শিব প্রায় সব মঙ্গলকাব্যের সূচনাভাগেই উপস্থিত। কবিরা শিবকে নিয়ে যে কাহিনী রচনা করেছেন, সেই শিব দরিদ্র, ভিক্ষুক, বহু সন্তানের পিতা, সংসার সম্পর্কে উদাসীন এবং কামলোলুপ।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলির বাস্তবভিত্তি স্বীকার করে বলা যেতে পারে শিব উচ্চ অভিজাত ধনী বণিক সমাজের আরাধ্য দেবতা হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি ছিলেন দেবাদিদেব, যাঁর সৃষ্টি রহস্য ছিল অজ্ঞাত। শাক্তভাব প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে মনসামঙ্গল

ও চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে বিশেষ করে শিব তাঁর পৌরাণিক আভিজাত্যকে ধরে রাখতে পারেন নি। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে শিব হয়ে উঠেছেন অলস, কর্মবিমুখ, পেটুক, ভিক্ষুক ও সর্বোপরি কামুক। এই শিবকে আবার 'প্রবাদ পুরুষ'ও বলা যায়। লোকসাহিত্য ধারার প্রবাদে শিব সবচেয়ে বেশি জনমানসে দেখা চরিত্রগুলির সঙ্গে মিলে মিশে গেছে। সাধারণত লোক জীবনে বিশেষ কোন আলোচনা বা গল্পের আসরে কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই কিছু প্রবাদবাক্য বেরিয়ে আসে, যা শিবকেন্দ্রিক। এই সকল প্রবাদে শিবের দেবত্বের গুণাবলী অন্তর্হিত হয়ে লৌকিক চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে বেশি।

শিবকেন্দ্রিক কিছু প্রবাদ হল—

১. শিব নেত্র -- ভাবালুতার কারণে চক্ষুস্থির।

২. ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাপেও জানতে পারে না— গোপনীয়তা রক্ষা করা।

৩. শিব নাচে রঙ্গে, পার্বতী নাচে সঙ্গে— পাগলের তালে তাল দেওয়া।

৪. শিবরাত্রির সল্‌তে—অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রাখা একমাত্র সন্তান।

৫. শিবের মাথায় নারকেল ভাঙা— উপযুক্ত শত্রুর উপযুক্ত অস্ত্র।

৬. শিবের অসাধ্য— কঠিন কাজ।

৭. শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না — অকর্মণ্য ব্যক্তি অথচ শাস্তি দেওয়া যায় না।

৮. ধান ভানতে শিবের গীত— প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয় চলাকালীন অপ্রাসঙ্গির বিষয় উপস্থিত করা।

৯. শিবহীন যজ্ঞ— উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে উপযুক্ত কার্যসিদ্ধি হয় না।

উপরিউক্ত প্রবাদগুলি থেকে বোঝা যায় শিব মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাঙালীর সমাজ এবং সংস্কৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরুষদেবতা হলেন শিব। প্রাগ্‌বৈদিক যুগে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতায় এক উল্লেখযোগ্য দেবতা ছিলেন শিব। পরবর্তী বৈদিক যুগে রুদ্রশিবের উল্লেখ আছে, বৈদিক পরবর্তী যুগে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগেও শিব সমান জনপ্রিয় ছিলেন। সুতরাং প্রাগ্‌বৈদিক যুগের শিব এবং বৈদিক যুগের রুদ্রদেবের সংমিশ্রণে বর্তমান শিবের স্বরূপ নির্মিত হয়েছে। এই শিবের মধ্যে— ''একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধন-মোচন, এই দুই-ই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব।''[৩]

উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে শিব চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া গেল। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে নির্বাচিত সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে শিব চরিত্রের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে প্রাগ্‌বৈদিক যুগ থেকে প্রাগ্‌ আধুনিক যুগ পর্যন্ত শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারাটিকে স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

করেছি। শিব চরিত্রের বিবর্তন বিষয়ক গবেষণামূলক কাজটি করার সময় আমার অন্বেষণে শিব চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, প্রথমে সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত পশুপতি শিবের আলোচনা করে তা স্পষ্ট করার প্রচেষ্টা রইল। সিন্ধু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল দুটি নগর— হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। মহেঞ্জোদারোতে একটি ত্রি-মুখ বিশিষ্ট পুরুষ মূর্তি পাওয়া গেছে, মনে করা হয় এটিই পশুপতি শিবের আদিমূর্তি। গুরুদাস ভট্টাচার্য 'বাংলা কাব্যে শিব' গ্রন্থে এই পুরুষ মূর্তিটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন— ''একটি চতুষ্কোণ বেদীতে যোগাসনে মূর্তিটি উপবিষ্ট— এ্যম্বক জটাধারী উলঙ্গ ঊর্ধ্বমেঢ্র; একটি হস্ত জানুতে, কটিতে কোমরবন্ধনী, হস্তে-বক্ষে আবরণী, মস্তকে যুগ্ম শৃঙ্গ; আসনের নীচে হরিণ, চারিদিকে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ ও ব্যাঘ্র। এই শিব সিন্ধুতীরের এই মহাযোগী যে প্রাগার্য কোন গোষ্ঠীর উপাস্য দেবতার পরিণত শিল্পরূপ, এ সম্পর্কে সংশয় না থাকারই কথা।''[৪] কিন্তু পশুপতি শিব সম্পর্কে এর থেকে বেশী জানা যায় না। তবে প্রাগার্য যুগে শিবের এই মূর্তিটির পূজা হত। পশুপতি শিব ছিলেন গবাদি পশুর রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। এছাড়া অন্য একটি শীলমোহরে শিবের সঙ্গে পার্বতীকেও দেখা যায়, অর্থাৎ শিব ও শক্তি উভয়েরই পূজা প্রাগার্য যুগের মানুষেরা করত। সেখানে শিবের বাহন ষাঁড় এবং পার্বতীর বাহন বাঘ। হরপ্পা সভ্যতায় নৃত্যের ভঙ্গীমাযুক্ত একটি পুরুষ দেবতার মূর্তি পাওয়া যায়, যা শিবের নটরাজ মূর্তি। তবে এইসকল শীলমোহর ও প্রাপ্ত ভাঙা মূর্তিতে শিবের তো কোন প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। তাই শিব চরিত্রের যে কোন বৈশিষ্ট্যই এখানে অনুপস্থিত।

প্রথম অধ্যায়ের নির্বাচিত সাহিত্যগুলিকে কয়েকটি উপপর্বে ভাগ করে আলোচনা করেছি। যেমন— 'বাংলা সাহিত্য-পূর্ববর্তী পর্বের সংস্কৃত সাহিত্যে শিব চরিত্রের স্বরূপ'— এই অধ্যায়ের নির্বাচিত সংস্কৃত সাহিত্যগুলিকে চারটি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

ক. বেদ
খ. রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত
গ. কালিদাস [কুমারসম্ভবম্ ও রঘুবংশম্]
ঘ. পুরাণ

প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্যগুলির আলোচনার মধ্য দিয়ে শিব চরিত্রের যে যে বৈশিষ্ট্য আলোচনায় উঠে এসেছে, সেগুলিকে উপপর্ব হিসেবে বিশ্লেষণ করে শিব চরিত্রের বিবর্তনকে পরিস্ফুট করেছি। প্রথমেই দেখা যায় (ক) **বেদ-উপনিষদের** মধ্যে শিব চরিত্র সম্পর্কে কী জানা গেছে। বেদে শিব নয়, আছেন রুদ্রদেব। যদিও ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি সূক্তেই রুদ্রদেবের উল্লেখ আছে। বেদের রুদ্রদেব ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁর জ্ঞান অসীম, তিনি রক্ষাকর্তা, মহৎ মেধাবী, অন্নদাতা, দেবতাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই সকল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি শিব চরিত্রের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বেদে আছে, যা পরবর্তী আর কোনো

সাহিত্যেই পরিলক্ষিত হয় না। যেমন— বেদের রুদ্রদেব বণিক, অরণ্যের রক্ষাকর্তা, শিল্পী, সূত্রধার, কুম্ভকার, কর্মকার, ব্যাধ, বিচারক। তাঁর হাতের অস্ত্র ধনুর্বাণ, পিনাক ও বজ্র। এই রুদ্রদেব ভয়ঙ্কর, কারণ বেদে অগ্নি ও রুদ্রকে সমার্থক বলা হয়েছে। ঋক্‌বেদে রুদ্র হলেন ভক্তের ভগবান। তাঁর বাহন বৃষ এবং তিনি বাঘছাল পরিধান করেন, জটায় ফণীকে ধারণ করেন। বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা। ঋগ্বেদে রুদ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল— ''তিনি উগ্র, হিংস্র, পশুতুল্য, তাঁর হাতের আয়ুধ বজ্র ও ধনুর্বাণ, বলিষ্ঠ তাঁর বাহু, সুগঠিত ওষ্ঠাধর, আদিত্যবৎ, ভাস্বর দেহকান্তি, সুবর্ণ নির্মিত অলংকার, কনকনিভ জটাকপাল, তিনি রথে বিচরণ করেন। তিনি ভীমদর্শন, ক্রূরকর্মা ও সংহারক। ..... তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগামী, শক্তিমান, যুদ্ধে অজেয়, তেজে অধৃষ্য ও ক্ষমতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি প্রাচীন হয়েও চির নবীন যুবক।''[৫] বেদে রুদ্রদেব দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। ঋগ্বেদে রুদ্রদেবের বহিরঙ্গ রূপের বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি অপূর্ব দেহ-মাধুর্য্যের অধিকারী, তিনি সুনাসিক ও কোমলোদর, কখনও তার বর্ণ রক্তিম, কখনও তিনি শ্বেতবর্ণ। ঋগ্বেদের পরবর্তী 'সামবেদ'-এ রুদ্রদেবের কোনো উল্লেখ নেই। যজুর্বেদে রুদ্রদেব অনুপস্থিত, কারণ - রুদ্র পরিবর্তিত হয়েছেন 'শিব'-এ। যজুর্বেদে শিব হলেন মঙ্গলময় দেবতা। যজুর্বেদে শিবকে পিতৃস্থানীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদে সমুদ্র মন্থনের উল্লেখ না থাকলেও তিনি নীলগ্রীবাযুক্ত, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল— যজুর্বেদে শিবকে দেখা যায়, তিনি মুন্ডিতকেশ। সিন্ধু সভ্যতায় যে পশুপতি শিবের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি যজুর্বেদেও শিবকে পশুদের দেবতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদের রুদ্র বা শিবই হলেন ধনদাতা ও বিদ্যাদাতা। উপনিষদের রুদ্র বা শিব হলেন শান্ত ও মঙ্গলময়। বেদের রুদ্রদেবের ভয়ঙ্করতা চলে গিয়ে তিনি উপনিষদে হয়েছেন মঙ্গলময় দেবতা।

(খ) বেদ-উপনিষদে শিবের যে রুদ্ররূপ ও মঙ্গলময় শান্তরূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তা পরবর্তী সংস্কৃত **রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের** অন্তর্গত শিব চরিত্রের স্বরূপের তুলনায় কোথায় পৃথক, তা অন্বেষণে তুলে আনা হয়েছে। মহামুনি বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' মহাকাব্যে শিব ভক্তের ভগবান, কৃপা ও করুণার মধ্য দিয়ে তিনি ভক্তের জীবন ভরিয়ে দেন। ত্রিলোকের কল্যাণের জন্য বিষ পান করেন, অর্থাৎ তিনি পরহিতে ব্রতী। সতীর মৃত্যুর পর শিবের রুদ্ররূপের প্রকাশ দেখা যায়, তবে রামায়ণে শিব শান্ত, সমাহিত। উমার সঙ্গে শিবের সংসার যাত্রার বর্ণনা আছে। বেদের রুদ্র বা শিব থেকে রামায়ণের শিব চরিত্র এখানেই পৃথক। কারণ বেদ বা উপনিষদের কোথাও শিবের স্ত্রীর উল্লেখ নেই কিংবা শিবের সংসার যাত্রার বর্ণনা নেই। কিন্তু মহামুনি বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত 'রামায়ণ'-এ শিব সতী ও উমা এই দুই স্ত্রীর স্বামী। বেদের রুদ্রদেব রামায়ণে এসে পুরোপুরি সংসারী পুরুষে পরিণত হয়েছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত মহাভারতে শিবের রুদ্ররূপের পরিচয় পাওয়া যায় দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের সময়, তাছাড়া সমগ্র মহাভারতে তিনি সৌম্য, শান্ত ও মঙ্গলময়। মহাভারতে সতীর উল্লেখ না থাকায় শিব একপত্নীক। রামায়ণের শিব থেকে মহাভারতের শিব চরিত্রের পার্থক্য দেখা যায় স্ত্রীর প্রতি শিবের মনোভাবে। স্ত্রীর দুঃখে তিনিও কাতর হয়েছেন। শিব চরিত্রে আরও একটি বৈশিষ্ট্য নতুন সংযোজন হল মহাভারতে, তা হল— সুন্দরী রমণীদের রূপলাবণ্য দেখে শিব কামোন্মত্ত হয়েছেন। বেদ-উপনিষদ বা সংস্কৃত রামায়ণে শিবের কামুক রূপ পরিলক্ষিত হয় না। মহাভারতের শিব ভক্তের ভগবান, পরহিত ব্রতে নিয়োজিত একজন মঙ্গলময় দেবতা।

'ভাগবত' আলোচনায় যে 'শিব' উদ্ভাসিত হয়েছেন তিনি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের শিব চরিত্র থেকে অনেকটাই পৃথক ও বিবর্তিত। শিবের দুই স্ত্রী— সতী ও উমা। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় যে একাধিক স্ত্রী রাখার প্রবণতা ছিল তার প্রমাণ আছে মহাভারতে। তবে শিবের দুই স্ত্রীর সম্পর্কিত কাহিনীতেই দাম্পত্য মধুরতা প্রকাশ পেয়েছে। স্ত্রীর অমঙ্গল আশঙ্কায় শিব শঙ্কিত হন, আবার স্ত্রী বিয়োগে মর্ত্য মানবের মতো বিচ্ছেদ বেদনায় রোদনও করেন। বিষ পান করলেও তা স্ত্রীর (উমা) সঙ্গে পরামর্শ করেই পান করেন, শিবের জীবনে স্ত্রীর গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল একজন পুরুষ। তবে সতীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে শিব নিজে যাননি, পাঠিয়েছেন অনুচরদের। তিনি লোকহিতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, কিন্তু পরিবর্তে তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। তাই তো মন্থনজাত কালকূট বিষ পান করলেও, অমৃতের ভাগ তিনি প্রত্যাশা করেন না। তবে ভাগবতের শিব চরিত্রে বেদের রুদ্রদেবের ভয়ঙ্করতা নেই, আবার রামায়ণ, মহাভারতের শিবের মতো সংযমও নেই। ভাগবতের শিব স্থূলরুচির অসংযমী পুরুষ। রমণী দেখলেই তিনি কামোন্মত্ত হন, তাঁর অসংযমী চরিত্রের সর্বাপক্ষো বড় উদাহরণ হল— নারায়ণের মোহিনী রূপ দেখে শিব স্ত্রীকে উপেক্ষা করে, নিরাবরণ হয়ে মোহিনী নারীর উদ্দেশ্যে ছুটে গেছেন। বেদের শিব 'ভগবান', কিন্তু চারিত্রিক স্থূলতার জন্য ভাগবতের শিব চরিত্রে দেবত্ব সংকুচিত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতের শিব চরিত্রে যে সংযম লক্ষ্য করা যায়, ভাগবতের শিব চরিত্রে তা অনুপস্থিত। তাই বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের শিব চরিত্র থেকে ভাগবতের শিব অনেকটা পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

(গ) কালিদাস বিরচিত 'কুমারসম্ভবম্' ও 'রঘুবংশম্' কাব্য দুটির অন্তর্গত শিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অলোচনা করে, পূর্ববর্তী বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের ও ভাগবতের শিব চরিত্র থেকে কালিদাসের শিব চরিত্রের পার্থক্য কতটা তা নিরূপণ করা হয়েছে। কালিদাস শিবকে মঙ্গলময় দেবতা রূপেই তাঁর কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন। কারণ স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ও দেবতাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কালিদাসের কাব্যে শিবের

রুদ্ররূপের প্রকাশ নেই। যদিও সতীর মৃত্যুর পর শিব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেন, তবুও তাঁর চরিত্রে ভয়ঙ্করতা নেই। পূর্বে আলোচিত বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের শিব চরিত্র থেকে কালিদাস বিরচিত শিব চরিত্র বহুলাংশেই পৃথক। কালিদাস শিবকে মর্ত্য মানবের বৈশিষ্ট্যে অঙ্কিত করেছেন। স্ত্রীর (সতী) মৃত্যুর পর তিনি সাধারণ মানবের মতোই ক্রন্দন করেছেন, আবার দ্বিতীয় স্ত্রী উমার সঙ্গে বিবাহের পর শিব রতি-অভিজ্ঞ পুরুষের মতোই স্ত্রীকেও দাম্পত্য মধুরতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। কালিদাসের শিব পুরোপুরি সংযমী পুরুষ। মদনের নিক্ষিপ্ত বাণে তাঁর যেমন চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না, তেমনি কুমারী পার্বতীর রূপ-সৌন্দর্য্যও তাঁর চিত্তবৈকল্য ঘটাতে পারেনি। পূর্বে আলোচিত সকল শিব চরিত্র থেকে কালিদাসের শিব যে অনেকটাই পৃথক তাঁর প্রমাণ হল— কালিদাসের শিব একজন স্নেহময় পিতা। এর পূর্বে শিবের 'পিতা' হওয়ার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। শিবের সংসারের বৃত্ত এখানে সম্পূর্ণ হয়েছে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তিনি ঘোরতর সংসারী, সন্তানের নানা ক্রিয়াকলাপ দেখে শিব সন্তান-সুখ উপভোগ করেছেন। এখানেই কালিদাসের রচিত শিব বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের শিব চরিত্র থেকে পৃথক সম্পূর্ণ এক নতুন বৈশিষ্ট্যের ধারক হয়েছেন, যা শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই কালিদাসের শিব প্রেমময় স্বামী, স্নেহময় পিতা, সংযমী চরিত্রের সংসারী পুরুষ, আবার অন্যদিকে জগৎ উদ্ধারক ও প্রতিপালক।

(ঘ) বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করে অষ্টাদশ পুরাণ, বিশেষত শিবপুরাণে শিব চরিত্রের যে সকল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা হল— সতীর মৃত্যুর পর শিব উগ্রমূর্তি ধারণ করেছেন, এখানে তিনি বেদের রুদ্রের মতো ভয়ঙ্কর। শিব পত্নীপ্রেমে উজ্জ্বল এক চরিত্র। স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে তিনি যেমন উগ্রমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তেমনি প্রতিশোধ গ্রহণের পর স্ত্রীর বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন। এর থেকেই তাঁর পত্নীপ্রেমের প্রগাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীর মৃতদেহকেও তিনি ছাড়তে নারাজ, স্ত্রীর দেহকে কাঁধে নিয়ে ত্রিভুবনে ঘুরে ঘুরে তিনি তাঁর শোকের নিবৃত্তি চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর শোক প্রশমিত হয়নি। বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহকে একান্নটি খণ্ডে খণ্ডিত করেন। খণ্ডগুলি মর্ত্যের যে যে স্থানে পড়েছিল, সেখানেই গড়ে ওঠে সতীপীঠ। স্ত্রীর প্রতি প্রীতিবশতঃ শিব সেই সব পীঠে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেও সতীর সঙ্গে অবস্থান করেছেন। যেমন— (১) ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে অবস্থিত 'বৈদ্যনাথ ধাম', সেখানে সতীর হৃৎপিণ্ড পড়েছিল। সতী এখানে 'জয়দুর্গা' ও শিব 'বৈদ্যনাথ' নামে পরিচিত। (২) শ্রীলঙ্কার জাফনায় অবস্থিত 'নয়নাতিভু', এখানে সতীর দেহখণ্ড বা পায়ের অলংকার নূপুর পড়েছিল। সতী এখানে 'ইন্দ্রাক্ষি' ও শিব 'রাক্ষসেশ্বর' নামে পরিচিত। (৩) তৃতীয় সতীপীঠ পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থিত। এখানে সতীর চোখ পড়েছিল। সতী এখানে 'মহিষমর্দিনী' এবং শিব 'ক্রোধিস্' নামে পরিচিত।

(৪) বাংলাদেশের বরিশালের নিকট শিকারপুরে অবস্থিত সতীপীঠ 'সুগন্ধা', এখানে সতীর নাসিকা পড়েছিল। সতী এখানে 'সুগন্ধা' ও শিব 'ত্রম্ব্যক' নামে পরিচিত। (৫) কাশ্মীরে অবস্থিত 'অমরনাথ', এখানে সতীর গলা পড়েছিল। সতী এখানে 'মহামায়া' এবং শিব 'ত্রিস্ত্যেশ্বর' নামে পরিচিত। (৬) হিমাচল প্রদেশের কাংরায় অবস্থিত সতীপীঠ 'জ্বালামুখী', এখানে সতীর জিহ্বা পড়েছিল। সতী এখানে 'সিদ্ধিদা' এবং শিব 'উন্মুক্ত' নামে পরিচিত। (৭) পাঞ্জাবের জলন্ধরে অবস্থিত সতীপীঠে সতীর বামবক্ষ পড়েছিল। এখানে সতী 'ত্রিপুরমালিনী' এবং শিব 'ভিষণ' নামে পরিচিত। (৮) নেপালে অবস্থিত সতীপীঠ 'গুহেশ্বরী' নামে পরিচিত, এখানে সতীর হাঁটু পড়েছিল। সতী এখানে 'মহাশিরা' এবং শিব 'কাপালি' নামে পরিচিত। (৯) তিব্বতের মানস সরোবরে সতীর ডানহাত পড়েছিল। সতী এখানে 'দক্ষিয়াণী' এবং শিব 'অমর' নামে পরিচিত। (১০) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে সতীর নাভি পড়েছিল। এখানে সতী 'সর্বমঙ্গলা' এবং শিব 'মহাদেব' নামে পরিচিত। (১১) নেপালের পোখরায় অবস্থিত সতীপীঠ 'গন্ধকি-মুক্তিনাথ মন্দির', এখানে সতীর মস্তিস্ক পড়েছিল। সতী এখানে 'গন্ধকি চণ্ডী' এবং শিব 'চক্রপাণি' নামে পরিচিত। (১২) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে কেতুগ্রামে অবস্থিত সতীপীঠ 'বেহুলা', এখানে সতীর বামহাত পড়েছিল। এখানে সতী 'বেহুলা দেবী' এবং শিব 'ভীরুক' নামে পরিচিত। (১৩) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে গুসকরায় অবস্থিত সতীপীঠ 'উজ্জনি', এখানে সতীর ডান কব্জি পড়েছিল। সতী এখানে 'মঙ্গলচন্দ্রিকা' এবং শিব 'কপিলাম্বর' নামে পরিচিত। (১৪) ত্রিপুরায় অবস্থিত সতীপীঠ 'উদয়পুর', এখানে সতীর ডান পা পড়েছিল। সতী এখানে 'ত্রিপুরাসুন্দরী' এবং শিব 'ত্রিপুরেশ' নামে পরিচিত। (১৫) বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অবস্থিত সতীপীঠ 'চন্দ্রনাথ' মন্দির, এখানে সতীর ডান হাত পড়েছিল। সতী এখানে 'ভবানী' এবং শিব 'চন্দ্রশেখর' নামে পরিচিত। (১৬) জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত সতীপীঠ 'জল্পেশ', এখানে দেবীর বাম পা পড়েছিল। এখানে সতী 'ভ্রামরী দেবী' এবং শিব 'অম্বর' নামে পরিচিত। (১৭) আসামের নীলাচলে অবস্থিত সতীপীঠ 'কামগিরি-কামাক্ষা', এখানে সতীর যোনীমুদ্রা পড়েছিল। সতী এখানে 'কামাক্ষা' এবং শিব 'উমানন্দ' নামে পরিচিত। (১৮) বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে অবস্থিত সতীপীঠ 'জোগাদ্ধ্যা', এখানে সতীর ডানপায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল পড়েছিল। এখানে সতী 'জোগাদ্ধ্যা' এবং শিব 'ক্ষীরখণ্ডক' নামে পরিচিত। (১৯) পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় অবস্থিত সতীপীঠ 'কালীঘাট', এখানে সতীর ডানপায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ব্যতীত বাকি আঙ্গুলগুলি পড়েছিল। সতী এখানে 'কালিকা' এবং শিব 'নকুলেশ্বর' নামে পরিচিত। (২০) উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে অবস্থিত সতীপীঠ 'প্রয়াগ', এখানে সতীর হাতের আঙ্গুল পড়েছিল। সতী এখানে 'ললিতা' বা 'মাধবেশ্বরী' নামে পরিচিত এবং শিব 'ভব' নামে পরিচিত। (২১) বাংলাদেশের সিলেটে অবস্থিত সতীপীঠ 'জয়ন্তিকা', এখানে সতীর বাম জঙ্ঘা পড়েছিল।

সতী এখানে ‘জয়ন্তী’ এবং শিব ‘ক্রমাদিশ্বর’ নামে পরিচিত। (২২) পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগের কাছে সতীপীঠ হল ‘কিরীটি’, এখানে সতীর মুকুট পড়েছিল। এখানে সতী ‘বিমলা’ এবং শিব ‘সাংবর্ত’ নামে পরিচিত। (২৩) উত্তরপ্রদেশের কাশীর কাছে অবস্থিত সতীপীঠ ‘বারাণসী’, এখানে সতীর কানের দুল পড়েছিল। সতী এখানে ‘বিশালাক্ষী’ বা ‘মণিকর্ণি’ এবং শিব ‘কালভৈরব’ নামে পরিচিত। (২৪) তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে অবস্থিত সতীপীঠ ‘কন্যাশ্রম’। এখানে সতীর পীঠ পড়েছিল। এখানে শক্তি ‘সর্বানী’ এবং শিব ‘নিমিষ’ নামে পরিচিত। (২৫) হরিয়ানায় অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘থানেশ্বর’, এখানে সতীর গোড়ালির হাড় পড়েছিল। এখানে সতী ‘সাবিত্রী’ এবং শিব ‘স্তনু’ নামে পরিচিত। (২৬) রাজস্থানে অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘মনিগন্ধ’, এখানে সতীর দুই হাতের বালা পড়েছিল। সতী এখানে ‘গায়িত্রী’ এবং শিব এখানে ‘সর্বানন্দ’ নামে পরিচিত। (২৭) বাংলাদেশের জৈনপুরে অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘শ্রীশৈল’, এখানে সতীর গলার অংশ পড়েছিল। সতী এখানে ‘মহালক্ষ্মী’ এবং শিব ‘সম্বরানন্দ’ নামে পরিচিত। (২৮) পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের বোলপুরে অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘কঙ্কালিতলা’, এখানে সতীর অস্থি ও হার পড়েছিল। সতী এখানে ‘দেবগর্ভা’ এবং শিব ‘রুরু’ নামে পরিচিত। (২৯) মধ্যপ্রদেশের কালমাধবে অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘অমরকন্টক’, এখানে সতীর বাম নিতম্ব পড়েছিল। এখানে সতী ‘কালী’ এবং শিব ‘অসিতাঙ্গ’ নামে পরিচিত। (৩০) মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক নামক স্থানে অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘শন্দেশ’, এখানে সতীর ডান নিতম্ব পড়েছিল। সতী এখানে ‘নর্মদা’ এবং শিব ‘ভদ্রসেন’ নামে পরিচিত। (৩১) উত্তরপ্রদেশের চিত্রকূটে অবস্থিত সতীপীঠ হল— ‘রামগিরি’, এখানে সতীর ডানবক্ষ বা স্তন পড়েছিল। এখানে শক্তি ‘শিবানী’ এবং শিব ‘চন্দ্রা’ নামে পরিচিত। (৩২) উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে অবস্থিত সতীপীঠ হল— ‘ভূতেশ্বর-মহাদেব মন্দির’, এখানে সতীর কেশগুচ্ছ পড়েছিল। সতী এখানে ‘উমা’ এবং শিব ‘ভৈরব’ নামে পরিচিত। (৩৩) তামিলনাড়ুতে অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘সূচী’, এখানে সতীর উপরের পাটির দাঁত পড়েছিল। এখানে শক্তি ‘নারায়ণী’ এবং শিব ‘সংহার’ নামে পরিচিত। (৩৪) হরিদ্বারের নিকটে অবস্থিত সতীপীঠ হল— ‘পঞ্চসাগর’, এখানে সতীর নীচের পাটির দাঁতসমূহ পড়েছিল। এখানে সতী ‘বরাহী’ এবং শিব ‘মহারুদ্র’ নামে পরিচিত। (৩৫) বাংলাদেশের বগুড়ার নিকট অবস্থিত সতীপীঠ হল— ‘ভবানীপুর’, এখানে সতীর বামপায়ের নূপুর পড়েছিল। সতী এখানে ‘অপর্ণা’ এবং শিব ‘বামন’ নামে পরিচিত। (৩৬) কাশ্মীরের লাদাখের নিকট অবস্থিত সতীপীঠ হল— ‘শ্রীপর্বত’, এখানে সতীর ডানপায়ের নূপুর পড়েছিল। সতী এখানে ‘শ্রীসুন্দরী’ এবং শিব ‘সুন্দরানন্দ’ নামে পরিচিত। (৩৭) পশ্চিমবঙ্গের তমলুকে অবস্থিত সতীপীঠ ‘বিভাস’, এখানে বামপায়ের নূপুরের অংশবিশেষ পড়েছিল। এখানে সতী ‘কপালিনী’ এবং শিব

‘সর্বানন্দ’ নামে পরিচিত। (৩৮) গুজরাটের জুনাগড়ে অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘প্রবাস’, এখানে সতীর পাকস্থলী পড়েছিল। সতী এখানে ‘চন্দ্রভাগা’ এবং শিব ‘বক্রতুণ্ড’ নামে পরিচিত। (৩৯) মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর নিকটে অবস্থিত সতীপীঠ হল— ‘ভৈরবী’, এখানে সতীর ওষ্ঠ পড়েছিল। সতী এখানে ‘অবন্তী’ এবং ভৈরব ‘লম্বকর্ণ’ নামে পরিচিত। (৪০) মহারাষ্ট্রের নাসিক নামক স্থানে অবস্থিত ‘বাণী’ হল সতীপীঠ। এখানে সতীর চিবুক বা থুতনি পড়েছিল। সতী এখানে ‘ভ্রামরী’ এবং শিব ‘বিক্রতাক্ষ’ নামে পরিচিত। (৪১) অন্ধ্রপ্রদেশের কাটালিঙ্গেশ্বরের মন্দির, যা ‘সর্বশৈল’ নামে পরিচিত একটি সতীপীঠ, এখানেও সতীর গলার অংশ পড়েছিল। সতী এখানে ‘রাকিনী’ এবং শিব ‘দণ্ডপাণী’ নামে পরিচিত। (৪২) রাজস্থানের ভরতপুরের নিকট অবস্থিত সতীপীঠ হল— ‘বিরাট’, এখানে সতীর বামপায়ের আঙ্গুল পড়েছিল। সতী এখানে ‘অম্বিকা’ এবং শিব ‘অমৃতেশ্বর’ নামে পরিচিত। (৪৩) পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার খানাকুলের নিকট অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘রত্নাবলী’, এখানে সতীর ডান কাঁধ পড়েছিল। সতী এখানে ‘কুমারী’ এবং শিব ‘শিব’ নামেই পরিচিত। (৪৪) ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘মিথিলা’, এখানে সতীর বাম কাঁধ পড়েছিল। সতী এখানে ‘উমা’ ও শিব ‘মহদর’ নামে পরিচিত। (৪৫) পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের নিকট নলহাটিতে অবস্থিত ‘নটলেশ্বরী’, এখানে সতীর শ্বাসনালী সহ, কণ্ঠনালী পড়েছিল। এখানে সতী ‘কালিকা দেবী’ এবং শিব ‘যোগেশ’ নামে পরিচিত। (৪৬) হিমাচল প্রদেশের কর্ণাট-এ অবস্থিত সতীপীঠ হল ‘কঙ্গরা’, এখানে সতীর দুই কান পড়েছিল। এখানে সতী ‘জয়দুর্গা’ এবং শিব ‘অভিরু’ নামে পরিচিত। (৪৭) পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের বক্রেশ্বরে অবস্থিত সতীপীঠে সতীর ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী অংশ পড়েছিল। এখানে সতী ‘মহিষমর্দিনী’ এবং শিব ‘বক্রনাথ’ নামে পরিচিত। (৪৮) বাংলাদেশের ঈশ্বরীপুরে অবস্থিত সতীপীঠ হল— ‘যশোরেশ্বরী’, এখানে সতীর হাতের তালু ও পায়ের পাতা পড়েছিল। সতী এখানে ‘যশোরেশ্বরী’ এবং শিব ‘চন্দা’ নামে পরিচিত। (৪৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দক্ষিণীদিহি গ্রামে অবস্থিত সতীপীঠ ‘অট্টহাস’, এখানে সতীর ওষ্ঠ পড়েছিল। সতী এখানে ‘ফুল্লরা’ এবং শিব ‘বিশ্বেশ্বর’ নামে পরিচিত। (৫০) পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের সাঁইথিয়ায় অবস্থিত সতীপীঠ ‘নন্দিকেশরী মন্দির’, এখানে সতীর গলার হার বা অলংকার পড়েছিল। সতী এখানে ‘নন্দিনী’ এবং শিব ‘নন্দীকেশর’ নামে পরিচিত। (৫১) সর্বশেষ সতীপীঠ হল ‘হিঙ্গুলী’ বা হিংলাজ, এখানে সতীর ব্রহ্মারন্ধ্র বা মস্তিষ্কের অংশ পড়েছিল। এটি পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থিত। এখানে সতী ‘কোট্টরী’ এবং শিব ‘ভীমলোচন’ নামে পরিচিত।

স্ত্রীকে ভালবেসে শিব নিজেকেও একান্নটি ভিন্ন নামে বিভক্ত করে সতীর কাছে অভিন্ন হয়ে থেকেছেন। যদিও পরে জগতের কল্যাণের জন্য গৌরীকে বিবাহ করেছেন।

গৌরী এবং দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে তার পরিপূর্ণ সংসার। দুই পুত্রকে কেন্দ্র করে শিব চরিত্রে বাৎসল্য রূপের প্রকাশ দেখা যায়। পুরাণে শিবের অপর একজন স্ত্রীরও পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি গঙ্গা। কুলীন সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষের মত তিনি একই গৃহে দুই স্ত্রীকে নিয়ে বাস করেছেন। একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শিব কামে ব্যাকুল একজন পুরুষ। পৌরাণিক সাহিত্যে শিব চরিত্রের এইসকল স্থূলতার দিক ফুটে উঠেছে। কিন্তু শিবের চরিত্রের স্থূলতার দিকটি থাকলেও তিনি পুরাণের মঙ্গলময় দেবতা। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতে শিবের যে রূপ আমরা দেখতে পাই, তার থেকে পুরাণের শিব কিছুটা হলেও স্বতন্ত্র। আবার কালিদাসের শিব চরিত্রের মতো সংযমী পুরুষ না হলেও, ভাগবতের শিব চরিত্রের মতো অসংযমীও নন। তাছাড়া বেদে শিব বা রুদ্র-র যে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়, যেমন— চিকিৎসক, বিচারক, শিল্পী, কুম্ভকার, কর্মকার ইত্যাদি পরিচয় পাওয়া যায় তা বেদ পরবর্তী সাহিত্যে অনুপস্থিত। এখানে বিবর্তিত শিব চরিত্র গৃহীপুরুষ, কখনো কামলোলুপ, কখনো বা সংযমী, ভক্তের ভগবান আবার মানবিক গুণও দেখা যায়। প্রথম অধ্যায়ের শিব চরিত্রে যে বিবর্তন দেখা গেল, পরবর্তী মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য ধারায় তা আরও কী কী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তনের ধারাকে বজায় রাখবে তা বিশ্লেষণের প্রয়াস রইল।

বেদে দেখা যায় রুদ্রদেব ব্যাধ, চিকিৎসক, বিচারক, কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি। কিন্তু রুদ্র বা শিবের এই পরিচয় বেদ ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যে কখনোই পরিলক্ষিত হয় না। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, কালিদাস রচিত কুমারসম্ভবম্ ও রঘুবংশম্ কাব্য, শিবপুরাণসহ অষ্টাদশ পুরাণে শিব চরিত্রের একাধিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যেমন— শিব কখনো রুদ্ররূপ ধারণ করেন, কখনো তিনি শান্ত, কখনো তিনি সংহার করেন, আবার কখনো তিনি মঙ্গলময়, সৌম্য। কখনো তিনি একপত্নীক, আবার কখনো একাধিক স্ত্রী নিয়ে একই বাড়িতে বাস করেন। যদিও স্ত্রী বর্তমান [বেদে শিবের স্ত্রীর উল্লেখ নেই] তবুও পরনারীর প্রতি আসক্তি শিবকে অসংযমী করে গড়ে তুলেছে। শিব চরিত্রে বাৎসল্য রসের প্রকাশ দেখা যায় কালিদাসের নির্বাচিত কাব্যসমূহে এবং পুরাণে। এর পূর্বে শিব চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ছিল অনুপস্থিত। সর্বোপরি তিনি ভক্তের ভগবান, সামান্য স্তব-স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে দেব, দৈত্য, নর ভেদাভেদ জ্ঞান না করে শিব বর প্রদান করেন। জগতের সকল ত্যাজ্য বস্তুকে তিনি গ্রহণ করেছেন, যেমন— চিতাভস্ম, সাপ, ধুতুরার ফল, বাঘছাল প্রভৃতি। বেদের রুদ্রদেব ঐশ্বর্যশালী, কিন্তু বেদ পরবর্তী সময়ে আর কোনো সাহিত্যে তাঁকে ঐশ্বর্যশালী রূপে দেখা যায় না, তিনি কদর্পক শূন্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাহিত্যের যুগ বিভাগ অনুযায়ী মধ্যযুগের নির্বাচিত অনুবাদ সাহিত্য, যেমন— কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এবং মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যগুলির মধ্যে শিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে, তা পূর্ববর্তী অধ্যায় থেকে

কতটা পৃথক তা দেখা হয়েছে। তাছাড়া এই পার্থক্য থেকে শিব চরিত্রের বিবর্তনকে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত করা হয়েছে যা আমাদের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথম অধ্যায়ে শিব চরিত্রের পৌরাণিক কাহিনী অর্থাৎ শিব-সতীর কাহিনী এবং সমুদ্রমন্থনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে পৌরাণিক শিব-চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় অনূদিত 'শ্রীরাম পাঁচালী'তে শিব চরিত্রের পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য অবলুপ্ত হয়েছে। সতীর কাহিনী না থাকায় এখানে শিবের উগ্ররূপ অনুপস্থিত। সমুদ্র মন্থনের কাহিনী না থাকায় জগৎ উদ্ধারের জন্য কালকূট বিষ পান করে শিব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, শিবের এই জগৎ-উদ্ধারক রূপও অনুপস্থিত। ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার জন্য শিবের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন ভক্তের আকূতিতে সাড়া দিয়ে তিনি গঙ্গাকে জটায় ধারণ করে, গঙ্গার বেগধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে গঙ্গাকে মর্ত্যে অবতরণ করতে সাহায্য করেছে। ভক্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখানে তিনি পরহিতে ব্রতী। যদিও শিব চরিত্রের যে 'ভক্তের ভগবানে'র রূপ, তা অন্তর্হিত হয়ে 'শ্রীরাম পাঁচালী'তে তিনি নিজেই ভক্ত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্যে শিবের ভক্তবৎসল রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু অনূদিত রামায়ণ 'শ্রীরাম পাঁচালী'তে তিনি নিজেই ভক্ত, 'রাম' তাঁর ভগবান। তবে শিব চরিত্রের পৌরাণিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গে কলহ করে। এই ঘটনা লৌকিক শিব চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

'শ্রীরাম পাঁচালী'-র শিব চরিত্রের বর্ণনার পাশাপাশি বাংলাভাষায় অনূদিত কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'-এ কাশীরাম দাসও কৃত্তিবাস ওঝার মতো শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনীকে বর্জন করেছেন। ফলে শিব চরিত্রের যে রুদ্ররূপ তা মহাভারতে অনুপস্থিত। তবে 'সমুদ্র মন্থন' কাহিনীর বর্ণনা করে শিব চরিত্রে পৌরাণিকতার আভাস দিয়েছেন কবি। অর্থাৎ শিবের জনহিতকর রূপের আভাস রয়েছে কাব্যে। মধ্যযুগের সাহিত্যে শিবের রুদ্ররূপ ও পৌরাণিক রূপের অবলুপ্তি ঘটে, শিব হয়েছেন শান্ত, ধ্যানমগ্ন, যোগী। মহাভারতের শিব পাবর্তী, দুই পুত্র— কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে ঘোরতর সংসারী পুরুষ। সংসারী হলেও শিব পরস্ত্রীকাতর, নারীর মোহিনীরূপ তাঁকে বিপথগামী করে। শ্রীরাম পাঁচালীতে শিব চরিত্রে কামলোলুপতা ও পরস্ত্রীকাতরতা নেই। তবে শিব চরিত্র যে বিবর্তিত হচ্ছে, এটা তারই-ই উদাহরণ। বৈদিক যুগে শিব চরিত্রে এই সকল বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় না। পৌরাণিক যুগে এর আভাস পাওয়া গেলেও প্রাক্ আধুনিক পর্বে এসে শিব চরিত্রে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের বৈশিষ্ট্য মুছে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক 'শিব' বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন।

মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যেও শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ নেই, সমুদ্র মন্থনজাত বিষ পান করে শিব জগৎকে উদ্ধার করেছেন— সেই কাহিনী ভাগবতে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে অনুপস্থিত। অর্থাৎ শিবের পৌরাণিক রূপের

কোনো উল্লেখ মালাধর বসু করেননি। আবার দেখা যায় ভাগবতে শিব অসংযমী চরিত্রের স্থূলরুচির একজন পুরুষ। কিন্তু মালাধর বসু যখন ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন, তখন তিনি শিব চরিত্রের স্থূলতার দিকটিকে বর্জন করেন। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু শিবপুত্র রূপে কার্তিক-গণেশেরও কোনো উল্লেখ নেই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের শিব ভক্ত-বৎসল। ভক্তকে বর প্রদান এবং ভক্তের রক্ষাকর্তা রূপেই শিব শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে উপস্থিত। ভক্তকে রক্ষা করতে তিনি নিজের আরাধ্য দেবতার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের শিব চরিত্রে তাই পৌরাণিকতার আভাস যেমন নেই, তেমনি লৌকিক বৈশিষ্ট্যও অনুপস্থিত।

প্রাক্ আধুনিক পর্বের সর্বাপ্রেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য শাখা হল 'মঙ্গলকাব্য'। মঙ্গলকাব্যে শিব চরিত্রের বিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমার নির্বাচিত চার শতাব্দীর বারোটি প্রতিনিধি স্থানীয় মঙ্গলকাব্যে শিব চরিত্রের ক্রমিক বিবর্তনই তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। উক্ত সময়সীমার মধ্যে একাধিক কবি মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্য রচনা করেছেন। অন্নদা-মঙ্গল কাব্য একমাত্র ভারতচন্দ্রই রচনা করেছেন। কিন্তু আমার আলোচনার সুবিধার্থে এক-একটি শতাব্দীর প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের কাব্যগুলিকে আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে আলোচনা করেছি। যেমন— পঞ্চদশ শতাব্দীর নির্বাচিত কাব্যগুলি হল— বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়', নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ', বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'। ষোড়শ শতাব্দীর নির্বাচিত কাব্যগুলি হল— দ্বিজ বংশীদাস রচিত 'পদ্মাপুরাণ', মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল', মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। সপ্তদশ শতাব্দীর নির্বাচিত কাব্যগুলি হল— জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল', কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল', রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্বাচন করেছি দুটি কাব্যকে। যথা— রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন', রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যকে।

নির্বাচিত মঙ্গলকাব্যগুলিকে সংশ্লিষ্ট কবিরা শিব চরিত্রটিকে যেভাবে অঙ্কিত করেছেন, তার মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায় দুটিতে, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিব চরিত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হয়েছে, তার তুলনায় মঙ্গলকাব্যের শিব কোন্ কোন্ জায়গায় পৃথক তার অন্বেষণ করা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনটি 'মনসামঙ্গল' ছাড়া আর কোন মঙ্গলকাব্য রচিত হয়নি। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে শিব পুরোপুরি গৃহস্থ পুরুষ। স্ত্রী চণ্ডী এবং দুই পুত্র— কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে শিবের সংসার। এছাড়াও শিবের সংসারে আছে কন্যা মনসা। কবি শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি জোর দেননি। লৌকিক শিব চরিত্রকেই কবি তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। শিব

চরিত্রের রুদ্ররূপ মনসাবিজয় কাব্যে দেখা যায় না। স্ত্রীর (উমা) মৃত্যু হলে শিবের যে হাহাকার এবং সংসার ত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করেছেন— তার মধ্য দিয়ে শিব চরিত্রে মানবিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে। কার্তিক ও গণেশের প্রতি মমত্ববোধ, কন্যার বিবাহের চিন্তা শিবের পিতৃসত্ত্বাকে তুলে ধরে। মনসামঙ্গল কাব্য রচনার পূর্বে শিবের কেবল দুই পুত্র ছিল। মনসামঙ্গলের কবিরা শিবকে কন্যার পিতা হিসেবে অঙ্কন করেছেন। শিব ও চণ্ডীর সংসার যাত্রার বর্ণনায় কবিরা মর্ত্য মানবের সংসারের চিত্রই উপস্থিত করেছেন। এখানে শিবের দেবত্ব লুপ্ত হয়েছে। সংসারের সপত্নী যন্ত্রণা, সৎ মায়ের অত্যাচার, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল সবই বিপ্রদাস শিবের সংসারে গ্রহণ করেছেন। এরকম ঘোরতর সংসারী শিব পরনারীতে আসক্ত। কামে মত্ত শিবের কাছে নারীই একমাত্র কাম্য— তাই ডোমনীও তাঁর কাছে প্রার্থিত বস্তু। এছাড়া কন্যার পরিচয় পাওয়ার পূর্বে যুবতী মনসাকে দেখে শিবের চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায়। দেবসভায় নৃত্যরত বেহুলার প্রতিও শিব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও মনসামঙ্গলের শেষে শিবকে স্বর্গের দেবতা হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু শিব দেবসুলভ কোনো আচরণ করেননি। বিপ্রদাসের অঙ্কিত শিব তাই স্ত্রীর অনুগত স্বামী, স্নেহময়, কর্তব্যপরায়ণ পিতা, কামে ব্যাকুল অসংযমী চরিত্রের একজন পুরুষ। মধ্যযুগের সমাজের সামাজিক অবক্ষয়ের বৈশিষ্ট্য শিব চরিত্রে বর্তমান। শুধুমাত্র কাব্যের শেষে লক্ষীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া এবং চাঁদ সওদাগরের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার সময় শিব চরিত্রে দৈবীভাবের জাগরণ ঘটেছে।

পঞ্চদশ শতকের অপর একজন মনসামঙ্গলের কবি হলেন নারায়ণ দেব। নারায়ণ দেবের কাব্যে শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ নেই। তাই নারায়ণ দেবের শিব চরিত্র পুরোপুরি লৌকিক। শিব একাধিক স্ত্রী নিয়ে একই গৃহে বাস করেন। মধ্যযুগের সমাজে একাধিক স্ত্রী রাখার যে প্রবণতা, শিবের চরিত্রেও তা বর্তমান। শিব গঙ্গা ও দুর্গা বা গৌরীকে নিয়ে সংসার করছেন। নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্য আলোচনার পূর্বে শিবের সন্তান হিসেবে কার্তিক-গণেশ, পরে মনসাকে দেখতে পাই। কিন্তু নারায়ণ দেব শিবের দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতীরও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ শিবের সংসার দুই স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তানকে নিয়ে। মনসার কারণে দুর্গার মৃত্যু হলে শিব স্ত্রীর বিয়োগ ব্যথায় মাটিতে লুটিয়ে ক্রন্দন করেছেন। স্ত্রীর প্রতি শিবের অনুরাগের এই তো প্রকাশ। স্ত্রীর প্রতি এত অনুরক্ত শিব কিন্তু পরনারীতে আসক্ত, এখানে শিবের কামলোলুপতার বর্ণনায় নারায়ণ দেব বিপ্রদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন। নারায়ণ দেবের শিব যে কোনো নারী দেখলেই তাদের আলিঙ্গন কামনা করেছেন। উপনিষদ, সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, অষ্টাদশ পুরাণ কিংবা কালিদাসের নির্বাচিত কাব্যসমূহে তো নয়ই, এমনকি প্রাক্ আধুনিক পর্বের অনূদিত শ্রীরাম পাঁচালী, মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় কোথাও শিব এতটা স্থূলরুচিসম্পন্ন নন। মঙ্গলকাব্যের শিব পুরোপুরি কবিদের লোকায়ত ভাবনার ফল। শিব

নেশা করে অনুচরদের নিয়ে ঘুরে বেড়ান, সংসার প্রতিপালনের ব্যাপারে তিনি উদাসীন। তবে শিব চরিত্রে একটি অন্যদিক ফুটে উঠেছে কাব্যে, মনসা কুকর্ম করলে কন্যাকে শাসন করতে শিব পিছপা হননি। বিপ্রদাসের শিবের মতই নারায়ণ দেবের শিবও তাই পত্নীপ্রেমে উজ্জ্বল, পিতার কর্তব্য পালনে অক্ষম হলেও স্নেহময় পিতা; নেশাগ্রস্ত, উদাসীন, কামলোলুপ একজন পুরুষ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর অপর একজন কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্য উভয় বঙ্গেই জনপ্রিয় ছিল। বিপ্রদাস ও নারায়ণ দেবের মতো বিজয়গুপ্তের কাব্যে শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ না থাকায় শিবের পৌরাণিক কিংবা বৈদিক রুদ্রের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। বিজয়গুপ্তের শিব স্ত্রৈণ, স্ত্রীর ভয়ে কন্যা মনসাকে গৃহে নিয়ে যেতে ভয় পেয়েছেন, আবার স্ত্রীর ভয়েই কন্যাকে অরণ্যে নির্বাসন দিয়েছেন। কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে ভীত হয়ে কন্যাকে নির্বাসন দিলেও, ডোমনীর আলিঙ্গন পেতে মরিয়া শিব কিন্তু তখন স্ত্রীর কথা ভাবেন নি। মনসার কারণে চণ্ডীর মৃত্যু হলে শিব স্ত্রীর বিরহে মাটিতে লুটিয়ে রোদন করেছেন, এমনকি আত্মহননের কথাও ভেবেছেন। বিজয়গুপ্তের রচিত শিবের দুই পুত্র— কার্তিক ও গণেশ, কন্যা মনসা। সাধারণ পিতার মতই কন্যা যুবতী হলে তার বিবাহের চিন্তায় শিব ব্যাকুল হয়েছেন। কন্যার সংসার অটুট রাখতে জামাইয়ের কাছে অনুরোধ করেছেন। সমুদ্র মন্থনের মতো পৌরাণিক কাহিনীকে কবি লৌকিক আধারে পরিবেশন করেছেন। মন্থনজাত বিষ পান করে জগৎকে উদ্ধার করেছেন। এখানেই জগৎ উদ্ধারের প্রসঙ্গে বিজয়গুপ্তের শিব বিপ্রদাস ও নারায়ণ দেব থেকে পৃথক। বিজয়গুপ্তের শিব তাই স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী, জগৎপালক, সত্য পালনে একনিষ্ঠ, কিন্তু চারিত্রিক স্থূলতার পরিচয় বহন করে কামে মত্ত স্থূলরুচির পুরুষ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর তিনজন বিশিষ্ট কবি বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত মনসার পূজা প্রচার বিষয়ক মনসামঙ্গল কাব্যে শিব চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, তা পূর্ববর্তী সাহিত্যের তুলনায় পৃথক। এই পার্থক্যসমূহই প্রাগার্য যুগ থেকে প্রাক্ আধুনিক পর্ব পর্যন্ত শিব চরিত্রের বিবর্তনের মূল ভিত্তি। তেমনি ষোড়শ শতাব্দীর নির্বাচিত কাব্যের কবিরা অর্থাৎ 'পদ্মাপুরাণ'-এর রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাস, মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল', মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যে শিব চরিত্র তাঁর কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তা-ই আলোচনার মূল বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ কাব্যে শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা আছে। পিতা দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে শিবনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেছেন এই সংবাদ শোনার পর ক্রোধান্বিত শিবের উগ্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে, যে বেদের মহারুদ্রকে স্মরণ করায়। স্ত্রীর প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ বশতঃ শিব সতীর মৃত্যুর জন্য দায়ী দক্ষকে শাস্তি দিয়েছেন। স্ত্রীর বিরহে শিব বিবাগী হয়েছেন। আবার দ্বিতীয় স্ত্রী দুর্গা মনসার

দংশনে মৃত্যুবরণ করলে শিব বক্ষে করাঘাত করে ক্রন্দন করেছেন। শুধু তাই নয়, দুর্গাকে শিব 'প্রাণপ্রিয়া' বলে সম্বোধন করেছেন। ইতিপূর্বে আর কোন কবির রচিত শিব স্ত্রীকে এরকম হৃদয়স্পর্শী সম্বোধন করেন নি। শিব একই গৃহে দুই স্ত্রী— গঙ্গা ও দুর্গাকে নিয়ে সংসার করেছেন। আবার সুদক্ষ পুরুষের মত সতীনদের ঝগড়ার মীমাংসা করে সংসারের শান্তি বজায় রেখেছেন। এরপরেও শিবের কামনা চরিতার্থ হয় না, মুনিপত্নী, ডোমনী, মনসা সকলেই প্রতিই শিব কামনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। দ্বিজ বংশীদাস রচিত শিব একজন কর্তব্য পরায়ণ ও স্নেহময় পুরুষ। তাই তো স্ত্রীদের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে শিব তাঁর মানস কন্যা মনসাকে গৃহে স্থান দিয়েছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যে শিব স্ত্রীর ভয়ে মনসাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন অরণ্যে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শিব কন্যাকে নির্বাসন দেননি, বিবাহ দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠাতে চেয়েছেন। তবে দ্বিজ বংশীদাস রচিত 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে শিব চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা এর পূর্বে আলোচিত কোন কাব্য সাহিত্যেই দেখতে পাওয়া যায় নি। শিব দরিদ্র, কপর্দক শূন্য, তবুও শ্বশুর হিমালয়ের দেওয়া বিপুল দান-যৌতুক ফিরিয়ে দিয়েছেন, আত্মসম্মানবোধের জাগরণে দ্বিজ বংশীদাসের রচিত শিব চরিত্র অনন্য।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একমাত্র মনসামঙ্গল কাব্যই পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে আরও একটি নতুন মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার বিষয়ক কাব্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ষোড়শ শতাব্দীতেই রচিত হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব দেবী চণ্ডীর স্বামী রূপেই নিজ ভূমিকা পালন করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত তিনজন কবির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে আমি নির্বাচন করেছি। সেগুলি হল— মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল', মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিব চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কিংবা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যসমূহে শিবকে আমরা যেভাবে চিনেছি, তার থেকে চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর স্বামী শিব বহুলাংশে পৃথক। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রারম্ভে শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনীর আভাস পাওয়া যায় মাত্র, বিবাহের পূর্বেই শিব নিজের দরিদ্র অবস্থার কথা দুর্গাকে জানিয়েছেন, এই কাজ করে শিব স্ত্রীর কাছে সৎ থাকতে চেয়েছেন। বিবাহের পর স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য শিব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ তিনি জীবিকার সন্ধান করেছেন। ইতিপূর্বে আর কোনো কাব্যে শিবকে জীবিকা অবলম্বন করতে দেখা যায় নি। শিবের এই বৈশিষ্ট্য একেবারেই নতুন। শিব সংসার প্রতিপালনের জন্য কোচ নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছেন। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য নিয়ে সন্তানদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করেছেন। সন্তানদের হাসিমুখ দেখে শিব তৃপ্তি অনুভব করেছেন। শিব স্ত্রীর অনুগত স্বামী, শিব চরিত্রে যখনই কোন অসংযম দুর্গার চোখে পড়েছে, তখনই তার নির্দেশে শিব নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন। দুর্গা যখনই কোনো

বিপদে পড়েছেন, তখনই শিব স্ত্রীকে রক্ষা করতে উপস্থিত হয়েছেন। স্ত্রীকে রক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য, তাছাড়াও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার কারণে শিব স্ত্রীকে বিপদে রক্ষা করেছেন। আবার অভিমান করে স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেলে শিব বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হয়েছেন। স্ত্রীর পূজা প্রচার বিষয়ে স্ত্রীকে সহায়তা করেছেন শিব। প্রাক্ আধুনিক পর্বের সামাজিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজে নারীর মর্যাদার জায়গা যেমন তৈরী হচ্ছে, তেমনি সে সময়ের কাব্যেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তাই স্ত্রী দেবতার পূজা প্রচারে সাহায্য করেছেন একজন পুরুষ দেবতা। মানিক দত্তের শিব চরিত্রে পৌরাণিক মহিমা একেবারেই অনুপস্থিত। এই শিব লৌকিক মহিমায় জারিত। তাই বলা যায় মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের শিব সাধারণ গৃহী পুরুষের মতোই একজন স্ত্রী নিয়ে, সন্তানদের নিয়ে সুখেই ঘর করেছেন। স্ত্রীর অনুশাসনে অসংযমী হতে পারেননি। সর্বোপরি শিব সংসার প্রতিপালনের জন্য জীবিকা গ্রহণ করেছেন। এরপরে যে সকল মঙ্গলকাব্য আলোচিত হবে সেখানে শিব কোনো না কোনো জীবিকা অবশ্যই গ্রহণ করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর অপর উল্লেখযোগ্য এবং ষোড়শ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। এই কাব্যে শিব একান্তভাবেই দেবী চণ্ডীর স্বামীরূপে উপস্থিত। কাব্যের প্রারম্ভে সতীর মৃত্যুজনিত কারণে শিব রুদ্ররূপ ধারণ করে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু এরপরই শিবের শান্ত, সমাহিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। শিবের পৌরাণিক রূপের আভাস দিয়েই কবি লৌকিক শিবের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী শিবের সংসারের বর্ণনা দিয়েছেন। শিবের একজন স্ত্রী - চণ্ডী, দুই পুত্র কার্তিক-গণেশকে নিয়ে শিবের সুখের সংসার। মুকুন্দ চক্রবর্তী শিবের আরও একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বিবাহের পর শিব হিমালয়ের গৃহে 'ঘরজামাই' হয়ে রয়েছেন। জীবিকা বিষয়ে কোনো চিন্তা নেই, সংসার বৃদ্ধি পেলেও, অর্থাৎ দুই পুত্রের জন্মের পরেও সংসার প্রতিপালনের বিষয়ে শিব নির্লিপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে শিব চরিত্রে আত্মমর্যাদাবোধের যে জাগরণ ঘটিয়েছিলেন, মুকুন্দ চক্রবর্তী তা অনুসরণ করেন নি। কিন্তু গৌরী বা চণ্ডীই কৈলাসে স্বামীগৃহে সংসার করার কথা ভেবে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছেন। শিব অলস, সংসার বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু কৈলাসে গিয়ে সংসার প্রতিপালনের জন্য শিব জীবিকা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন। শিব ভোজন-রসিক, ইতিপূর্বে আর কোনো কবি শিবের খাদ্যপ্রিয়তার ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করেননি, মুকুন্দ চক্রবর্তী করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর শিব অলস, কর্মবিমুখ, উদাসীন, হাস্যকর কাণ্ড করেন নেশা করে। মুকুন্দ চক্রবর্তী শিবকে সংযমী পুরুষ রূপেই কাব্যে উপস্থিত করেছেন। বাংলাদেশের দরিদ্র গৃহস্থের মতই শিব স্ত্রী-সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য ত্রিশূল বাঁধা দিয়েছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর শিব চরিত্রে দৈবীভাব লুপ্ত হয়ে শিব একান্তভাবেই একজন দরিদ্র গৃহস্থ।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নির্বাচিত গ্রন্থ দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'-এ শিব খুব সামান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। সমুদ্র মন্থনের কাহিনীর সামান্য আভাসমাত্র দিয়েই কবি পৌরাণিক কাহিনী থেকে সরে এসেছেন। এই কাব্যে শিব-সতী বা শিব-গৌরীর সংসার বর্ণনাও নেই। শিবের ভক্তবৎসল রূপটিকেই কবি যত্ন-সহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন কাব্যে। ষোড়শ শতাব্দীর আলোচিত অন্যান্য কাব্যগুলিতে শিবের ভক্তবৎসল রূপের প্রকাশ দেখা যায়নি। তারা শিবের মানবিক দিকটির প্রতিই বেশী দৃষ্টিপাত করেছেন। কিন্তু দ্বিজ মাধব তাঁর শিবের মানবায়ন ঘটাতে অক্ষম হয়েছেন। শিব তাঁর দৈবী মহিমা নিয়েই কাব্যে উপস্থিত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর শিব চরিত্রে অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও, অমিলও প্রচুর। ষোড়শ শতাব্দীর শিব সংসার প্রতিপালনের জন্য জীবিকা গ্রহণ করেছেন, ঘরজামাই হয়ে থেকেছেন, দারিদ্রের কারণে সংসারের অভাব কমাতে ত্রিশূল বাঁধা দিয়েছেন। অর্থাৎ শিব দরিদ্র এবং দারিদ্র্য তার নিত্য সঙ্গী।

সপ্তদশ শতাব্দীতে জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল', কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' এবং রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন' কাব্যকে গ্রহণ করেছি। জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে শিব চরিত্রের পৌরাণিক রূপের কোনো উল্লেখ নেই। এই শিব মূলতঃ লৌকিক। তৎকালীন সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বাহক হয়ে শিব ঘরে স্ত্রী গঙ্গা থাকা সত্ত্বেও আবার দুর্গাকে বিবাহ করেছেন। কিন্তু প্রথম রাতেই ঘুমন্ত দুর্গাকে একা ঘরে রেখে গঙ্গার ঘরে রাত কাটিয়েছেন। তাই প্রথম থেকেই সতীনদের মধ্যে কলহের সূচনা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের শিব চরিত্র পুরোপুরি অসংযমী পুরুষ। যে কোনো নারী দেখলেই তিনি তাদের আলিঙ্গন কামনা করেন। এই স্থূলতার পাশাপাশি শিব আবার পত্নীগত প্রাণ। মনসার দংশনে দুর্গার মৃত্যু হলে শিব মাটিতে লুটিয়ে ক্রন্দন করেছেন, শিব দুর্গাকে 'প্রাণেশ্বরী' বলে সম্বোধন করেছেন। এর পূর্বে শিব স্ত্রীকে প্রাণপ্রিয়া বলে সম্বোধন করেছিলেন। স্ত্রীর প্রতি অনুরাগের প্রকাশ ঘটেছে এই সম্বোধনে। শিব আবার অপত্যস্নেহেও উজ্জ্বল। ঘরে ফিরে কার্তিক-গণেশকে কোলে তুলে নিয়ে শিব সন্তানসুখ উপভোগ করেছেন। আবার কন্যা মনসা বিবাহযোগ্যা হলে তাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করে পিতার কর্তব্য পালন করেছেন। বৈদিক যুগের রুদ্ররূপের প্রকাশ যেমন এই শিব চরিত্রে অনুপস্থিত, তেমনি পৌরাণিক যুগের শান্ত, তপস্যারত শিবও এখানে উপস্থিত নেই। তা হলে জগজ্জীবন ঘোষালের শিব পুরোপুরি লৌকিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একজন মর্ত্যমানব, শিব চরিত্রের দৈবী মহিমা এখানে লুপ্ত হয়েছে।

শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের শিব অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র। কেতকাদাস শিব চরিত্রে পৌরাণিক মহিমার উল্লেখ করেননি। এই শিব জগৎপালক, জগতের মঙ্গলকামনায় মন্থনজাত বিষ পান করেছেন, কিন্তু মন্থনজাত সম্পদের তিনি ভাগীদার হননি। এই শিব ভক্তের ভগবান, সামান্য স্তব-স্তুতিতে সন্তুষ্ট

হয়ে ভক্তকে বর প্রদান করেন, ভক্তকে সাহায্য করেন প্রত্যক্ষভাবে। অপরের দুঃখে সমব্যথী হন। তাই তো স্বামী পরিত্যক্তা গঙ্গাকে শিব নিজ গৃহে ঠাঁই দিয়েছেন, আবার বেহুলাকে বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ গঙ্গাকে শিবের স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেননি। শিবের স্ত্রী গৌরী, তাঁদের পুত্ররা কার্তিক ও গণেশ। এদের নিয়ে শিবের সুখের সংসার। সেই সংসারে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে শিবের মানস কন্যা মনসার আগমনে। কিন্তু গৌরীর বিরোধিতায় শিব মনসাকে নির্বাসন দিয়েছেন। কিন্তু পিতার কর্তব্য পালনে তিনি সচেষ্ট। বাংলাদেশের দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতই শিবের নিজের ত্রিশূল বাঁধা দিয়ে অর্থের সংস্থান করে কন্যার বিবাহের আয়োজন করেছেন। এখানে শিব ভিখারী, সংসার প্রতিপালন করতে তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন। কিন্তু শিব নেশাগ্রস্ত, ভূত-প্রেত, অনুচরদের নিয়ে ঘুরে বেড়ান। এতকিছুর পর শিব মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিব কামলোলুপ। তবুও পৌরাণিক মহিমা বর্জিত শিব আদ্যন্ত সংসারী একজন মানুষ, যার মধ্যে দোষ-গুণ উভয়ই বর্তমান।

সপ্তদশ শতাব্দীর নির্বাচিত দুটি মনসামঙ্গল কাব্যের শিব চরিত্রের আলোচনায় যে সকল বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তারই আলোকে সপ্তদশ শতাব্দীর অপর একটি মঙ্গলকাব্য 'শিবায়ন'-এর শিব চরিত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র (ভট্টাচার্য) সুবিশাল 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র তাঁর কাব্যের প্রারম্ভে বিস্তারিত ভাবে শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন। শিব-সতীর দাম্পত্য সম্পর্ক খুবই মধুর, স্ত্রীর মঙ্গল-অমঙ্গলের আশঙ্কায় শিব চিন্তিত হন। আবার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ শুনে শিব চরিত্রে রুদ্ররূপের প্রকাশ দেখা যায়। শিব ভক্ত-বৎসল, সামান্য তপস্যায় তুষ্ট শিব ভক্তদের বর দান করেন, ভালোমন্দের বিচার সেখানে মূল্যহীন। ভক্তকে রক্ষা করতে শিব নিজেই অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। তাই তো মন্থনজাত বিষ পান করে তিনি 'নীলকণ্ঠ' হলেন। সতীর প্রতি শিবের যেমন প্রগাঢ় ভালোবাসা, তেমনি গৌরীকে দেখেও শিবের মনে প্রেমের স্ফূরণ ঘটেছে। তাইতো স্ত্রী-গৌরী এবং কার্তিক-গণেশকে নিয়ে শিব সংসার করেন। যদিও শিবের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গঙ্গারও উল্লেখও আছে। শিব দরিদ্র, ভিক্ষাজীবী। তাই দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে শিব ও গৌরীর যেমন কলহ বেঁধেছে, তেমনি দুই সতীনও বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এই শিব আবার পরনারীতে আসক্ত হন, স্ত্রীদের উপেক্ষা করেন। কিন্তু পিতার কর্তব্য পালনে শিব অবহেলা করেন নি। অবহেলিতা কন্যা মনসাকে একটু শান্তি দিতে সুপাত্রে তাঁকে সম্প্রদান করেছেন। তাই রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিব চরিত্রে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় কাহিনীর মেলবন্ধন দেখা যায়। তবুও বলা যায় এই শিব চরিত্রে দৈবীভাব ম্লান হয়ে মানবায়ন ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর দুটি মনসামঙ্গল কাব্যে শিব চরিত্রের যেসকল বৈশিষ্ট্য

ফুটে উঠেছে, তার থেকে শিবায়নের শিবের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য শিবচরিত্রের বিবর্তনকে সমৃদ্ধ করেছে, তথ্যের সরবরাহ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দুটি প্রতিনিধি স্থানীয় মঙ্গলকাব্য হল— রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিবায়ন' এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য। শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারায় রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাব্য। কারণ এই কাব্যে শিব চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে, আর অন্য কোনো কাব্যে শিবের সেইসকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে শিবের জীবিকা হল কৃষিকাজ, আর স্ত্রীর মানভঞ্জনের জন্য তিনি শাঁখারী সেজেছেন। এই দুই লৌকিক কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী শিব চরিত্রে এই সকল বৈশিষ্ট্য নেই। কাব্যের প্রারম্ভে শিব-সতীর পৌরাণিক কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। পিতৃগৃহে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করলে শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন। শিবায়নের পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে দেখা যায় সতীর মৃত্যু হলে শিব তাঁর অনুচরদের পাঠিয়েছেন দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করতে। কিন্তু রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব নিজেই গিয়েছেন স্ত্রীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে। স্ত্রীর মৃতদেহকে নিয়ে শিব ক্রন্দন করেছেন, ফলে শিবের দৈবী মহিমা সঙ্কুচিত হয়েছে। শিব দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন গৌরীকে। গৌরীকে বিবাহ করে শিব শ্বশুরালয়ে থেকেছেন। কিন্তু ঘরজামাই থাকায় তাঁর বিবেকে দংশন হওয়ায় স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে কৈলাসে ফিরে গিয়েছেন। সংসার প্রতিপালনের জন্য কোচ নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছেন। অলসতার কারণে সংসারে নিত্য অভাব। অভাবের কারণেই গৌরীর সঙ্গে শিবের বিবাদের সূচনা। ভিক্ষা করে, ধার-কর্জ করে শিব সংসার চালান। এত অভাবের মধ্যেও শিব অলস, উদাসীন, নেশা করতে পারদর্শী। পরনারী আসক্তিও শিব চরিত্রের একটি বড় দিক। কামলোলুপ শিবের কাছে কোচ রমণী, বাগ্‌দিনী, ডোমনী, পাটনী সকলেই সমান। স্থূলতার পাশাপাশি শিব চরিত্রের উজ্জ্বল দিক হল তাঁর অপত্য স্নেহ। ভিক্ষা করতে গিয়ে শিব সন্তানদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। সন্তানদের খেতে দেখে নিজে তৃপ্তি লাভ করেছেন। সংসারের অভাব দূর করতে গৌরী শিবকে চাষ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কৃষক শিবের সঙ্গে পাঠকের এই প্রথম পরিচয়। ত্রিশূল ভেঙে চাষের যন্ত্র বানিয়ে শিব মর্ত্যে চাষ করতে এসেছেন। কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রম করে শিব ধান ফলিয়েছেন জমিতে। ক্ষেত ভরা পাকা ধান দেখে শিব সফল কৃষকের মতো গৌরব বোধ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধের উদয় হয়েছে, তার ফলেই মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করার পরিবর্তে, কায়িক পরিশ্রম করে খাদ্যের সংস্থান করাকে মানুষ শ্রেয় মনে করেছেন। শিব চরিত্রেও সেই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এখানেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়নের শিব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আবার অভিমানাহত স্ত্রীর মানভঞ্জনের জন্য শিব

নিজে শাঁখারী সেজে স্ত্রীর মান ভাঙিয়ে স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছেন। এখানেই তাঁর পুরুষ সত্ত্বার জয় ঘোষণা হয়েছে। শিবায়নের শিব চরিত্রে এসে পুরোপুরি মানবায়ন ঘটল।

প্রাক্ আধুনিক পর্বের শেষ মঙ্গলকাব্য হল 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য। এটি দেবী অন্নপূর্ণার পূজা প্রচার বিষয়ক কাব্য। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বিরচিত 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে শিব চরিত্রে পৌরাণিকতার আভাস আছে। শিব-সতীর কাহিনীতে দেখা যায় সতীর মৃত্যুর পর শিব নিজে দক্ষকে শাস্তি দিয়েছেন। সতীর মৃত্যুতে শিব বিলাপ করে নিজের দৈবী মহিমাকে ক্ষুণ্ন করেছেন। শিব-সতীর দাম্পত্য যেমন মধুর, তেমনি শিব-উমার সম্পর্কও প্রেমের প্রকাশে উজ্জ্বল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর শিব ঘরজামাই হয়ে থেকেও তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়নি। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব ঘরজামাই হয়ে থেকে বিবেক দংশনে ফিরে গেছেন কৈলাসে, কিন্তু মধ্যযুগের শেষে অন্নদা-মঙ্গলের শিব বিবাহের পরদিনই স্ত্রীকে নিয়ে নিজ-গৃহ কৈলাসে ফিরে গেছেন। শিব দুই সন্তানের পিতা। ভিক্ষা করেই তিনি সংসার প্রতিপালন করেন। কৃষক শিব আবার ভিখারীতে পরিণত হয়েছেন। দরিদ্র হলেও গ্রাম বাংলার মানুষদের মতো শিব ভোজন রসিক। কিন্তু সব দিন পেট ভরে খেতে পান না। সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর যে ন্যূনতম চাহিদা পেট ভরে দুটো ভাত খাওয়া, শিব সেটাই কামনা করেছেন। ক্ষুধার সময় খাদ্য না পেয়ে শিব গৃহত্যাগ করেছেন। কিন্তু অভাবের মধ্যে শিব নেশার সামগ্রী সংগ্রহ করতে ভোলেননি। বিবাহের পূর্বে শিব চরিত্রে অসংযম থাকলেও, বিবাহের পর শিব স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে সংযমী জীবন যাপন করেন। আধুনিক যুগের প্রাক্ মুহূর্তে নারীশক্তির জয় ঘোষণা হয়েছে। শিব অন্নের জন্য স্ত্রীর পূজা করেছেন, অন্নের অভাব মিটলে স্ত্রীর পূজা প্রচারে সহায়তা করেন। তাই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিবর্তিত হতে হতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে শিব হলেন স্ত্রীর অনুগত স্বামী, নারীর কাছে আত্মসমর্পণকারী একজন পুরুষ।

উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে মঙ্গলকাব্যে শিব চরিত্রের বিবর্তন-এর ধারাটি পরিস্ফুট হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিব চরিত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্নদামঙ্গলের শিবে পরিণত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিব চরিত্র বিবর্তিত হয়ে দেবতা থেকে মানব হয়েছেন, যে মানুষ দোষ-গুণ সম্বলিত। চার শতাব্দী ধরে মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাদের কল্পনা ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে শিব চরিত্রের বিবর্তন তুলে ধরেছেন তাদের রচনায়, — কখনো সচেতনভাবে, আবার কখনো বা অবচেতন মনেই কাজ করে চলেছে উক্ত প্রক্রিয়াটি।

বৈদিক শিবকে আমরা পাই রুদ্ররূপে, সেখানে তিনি প্রলয়রূপী ধ্বংসের দেবতা। আবার পৌরাণিক যুগে এই প্রলয়কারী মহারুদ্র হয়েছেন যোগী-যোগীশ্বর। কিন্তু পরবর্তীকালে মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের কবিদের হাতে এই শিব কখনও কৃষক, কখনও বা

ভিখারী, অবার কখনও কামুক। কামুক শিবের কল্পনা পুরোপুরি লোকায়ত ভাবনার ফল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শিব হলেন কামাসক্ত পুরুষ, সংসারে তাঁর অনীহা, ষোড়শ শতাব্দীতে দেখেছি শিব স্ত্রী-পুত্রসহ ঘোর সংসারী, কিন্তু সংসার প্রতিপালনে তিনি অক্ষম এবং পরস্ত্রীতেও প্রবল আসক্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর শিব কামুক, একাধিক বিবাহ করে কুলীন স্বামীর মতো একগৃহে একাধিক স্ত্রী নিয়ে বসবাস করেন। এই শিব চরিত্রে পিতৃসত্ত্বার জাগরণ ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিব হয়েছেন সংসারে মনোযোগী পুরুষ। স্ত্রীর পরামর্শে চাষ করেছেন, আবার কখনও জগৎ উদ্ধারের চিন্তায় মগ্ন, স্ত্রীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল পুরুষরূপে আমরা শিবকে পেয়েছি 'অন্নদা-মঙ্গলে'। মঙ্গলকাব্যে শিব চরিত্রের বিবর্তন আলোচনার উপসংহারে পৌঁছে পরিশেষে যে কথাটি বিশেষভাবে বলতে হয়, তা হল— পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের হাত ধরে বিবর্তিত হতে হতে শিব বৈদিক, পৌরাণিক দেবতা থেকে সাধারণ মানবে পরিণত হয়েছেন। দেবতার মানবায়ন মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই দেবতা শিব মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের কবিদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে এসেছেন ভিখারী ও কৃষক রূপে। শিব চরিত্রের এই বিবর্তনই বর্তমান আলোচনার মুখ্য অবলম্বন। আসলে দেবতাকে এখানে মানুষের মূর্তিতে গড়ে তোলায় কবিদের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই মানবিক হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়— ''স্ত্রী-পুরুষের কলহ ও গৃহস্থালির বর্ণনা যাহা আছে, তাহাতে রাজভাব ও দেবভাব কিছুই নাই, তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত।''[৬]

চতুর্থ অধ্যায়ে অপ্রধান সাহিত্য ধারা, অর্থাৎ নাথ সাহিত্য ও শাক্তপদাবলীতে শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারা আলোচিত হয়েছে। নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত প্রধান দুটি কাহিনী— গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন এবং গোপীচন্দ্রের গান বা ময়নামতীর গীত-এ শিব চরিত্র নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভে দেখা যায় গোরক্ষবিজয় কাব্যের শিব হলেন নাথ সিদ্ধাচার্যদের আদিগুরু। সেখানে শিবের কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই সামান্য পরিসরে শিব এখানে উপস্থিত। মঙ্গলকাব্যে শিব চরিত্রের মতো নাথ সাহিত্যের শিবও একাধিক স্ত্রী নিয়ে সংসার করেন। তবে উল্লেখ থাকলেও গঙ্গার কোনো প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কাব্যে নেই। মঙ্গলকাব্যের শিবের মতো এই শিব নেশাখোর, হাড়মালা পরিধান করে সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে শ্মশানে ঘুরে বেড়ান। স্ত্রীর প্রতি শিবের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় গোরক্ষনাথের দ্বারা গৌরীকে বন্দী করার পর। স্ত্রীর চিন্তায় ব্যাকুল শিব গৌরীকে খুঁজেছেন সর্বত্র, না পেয়ে গোরক্ষনাথের কাছে সন্ধানে গিয়েছেন। নাথসাহিত্যে শিব ভক্তের ভগবান, ভক্তকে বর দান করে সমৃদ্ধ করেন। তবে মঙ্গলকাব্যের শিবের থেকে নাথ সাহিত্যের শিব পৃথক হয়েছেন তত্ত্বালোচনার দিক থেকে। নাথসাহিত্যের শিব চরিত্রে পৌরাণিক বা

লৌকিক কোনোরকম বৈশিষ্ট্যের প্রভাব দেখা যায় না। নাথ সাহিত্যের শিব পুরোপুরি স্বতন্ত্র এক শিব চরিত্র।

শাক্তপদাবলীর আগমনী ও বিজয়া গানে উমা বা গৌরীর স্বামী রূপেই শিবের সক্রিয়তা। শিব স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ঘোরতর সংসারী পুরুষ। ভিক্ষাই তাঁর জীবিকা। সুষ্ঠুভাবে সংসার প্রতিপালন অপেক্ষা শিব অনুচরদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতেই বেশী পছন্দ করেন। ভাঙ্গ-ধুতুরা খেয়ে নেশা করেন। কোন কোন পদে শিবের দ্বিতীয় স্ত্রী গঙ্গার উল্লেখ আছে। শিব স্ত্রীর অনুগত স্বামী, স্ত্রীকে ছেড়ে বছরে তিনদিনও থাকতে পারেন না। গৌরীকে আনতে হিমালয় গৃহে চলে যান। শাক্ত পদাবলীর শিব চরিত্রে স্থূলতা নেই। তবে পৌরাণিক ও লৌকিক কোন মহিমাই শিব চরিত্রে নেই। এই শিব একান্তভাবেই শাক্তপদাবলীর শিব। প্রথম অধ্যায়ের সংস্কৃত সাহিত্যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা মঙ্গলকাব্যে শিব চরিত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা চতুর্থ অধ্যায়ের শিব চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শিব চরিত্রের বিবর্তনের ধারায় নাথসাহিত্য ও শাক্ত পদাবলীর শিব আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। প্রাক্ আধুনিক পর্বের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জীবিকার সন্ধান উভয় কাব্যেই দেখা যায়, অর্থাৎ উভয় কাব্যেই শিব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, দুই স্ত্রী নিয়ে ঘর করেছেন, নেশাখোর, অলস, কর্মবিমুখ। এই শিব অসংযমী নয়, স্ত্রীর বাধ্য স্বামী।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে শিবের বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক স্বরূপের আলোচনার মাধ্যমে এবং নির্বাচিত কাব্যগুলির বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাগার্য যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রাক্ আধুনিক পর্ব পর্যন্ত শিব চরিত্র বিবর্তিত হয়েছে। বৈদিক যুগের ভগবান রুদ্র প্রাক্ আধুনিক পর্বে এসে পরিণত হয়েছেন ভিখারী ও কৃষকে। সাধারণ মানবের মতোই খাদ্যের সংস্থানের জন্য ও সংসার প্রতিপালনের জন্য শিবকে পথে-ঘাটে ঘুরতে হয়েছে। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ভগবান শিব ভক্তকে বরদান করে সমৃদ্ধ করলেও, প্রাক্ আধুনিক পর্বের শিব কপর্দক শূন্য হয়ে অসমৃদ্ধই থেকেছেন। 'বিবর্তনের ধারায় প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পর্বে শিব চরিত্র' শীর্ষক গবেষণামূলক কাজটি করতে গিয়ে আমি অনুসন্ধান করেছি— প্রাগার্য যুগ থেকে প্রাক্ আধুনিক পর্ব পর্যন্ত শিব চরিত্র কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, দীর্ঘসময় ধরে শিব চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং তন্মধ্যে যে পার্থক্য খুঁজে পেয়েছি তা চারটি অধ্যায়ের মধ্যে ব্যক্ত করার আন্তরিক চেষ্টা করেছি। এই অন্বেষণে 'দেবতা শিব' সাধারণ মর্ত্য মানবে পরিণত হয়েছেন।

তথ্যসূচী :

১. ‘লোক সংস্কৃতি গবেষণা’ পত্রিকা-কার্তিক-পৌষ ১৪১৩ ‘বাঙলার শিব ও লোকসংস্কৃতি’ - বিশেষ সংখ্যা, ১৯ বর্ষ ৩ সংখ্যা। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৬০ জেমস লঙ্ সরণি, বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪

২. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা - ৭০০০৭৩, পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ- ১৯৯৮, দশম পুনর্মুদ্রণ- এপ্রিল - ২০০২, পৃষ্ঠা- ৭৩.

৩. প্রাচীন সাহিত্য-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ- ১৩১৪, পুনর্মুদ্রণ - শ্রাবণ- ২০০২, পৃষ্ঠা ৩১

৪. বাংলা কাব্যে শিব - গুরুদাস ভট্টাচার্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকতা- ৭, প্রথম সংস্করণ - ৭ই আশ্বিণ ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১৭

৫. বিবর্তনের ধারায় শিব ও শিবলিঙ্গ - অশোক রায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৩৭ -৩৮

৬. রবীন্দ্র রচনাবলী ৬, গ্রাম্য সহিত্য, বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ - চৈত্র ১৩৫২, পুনর্মুদ্রণ- আশ্বিন ১৪১৭, পৃষ্ঠা -৬৪৮